



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 436 - 444

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

পুরুলিয়ার ঐতিহ্যবাহী লোক উৎসব টুসু

ড. মুনাই প্রামাণিক

সহকারী অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বলরামপুর কলেজ, পুরুলিয়া

Email ID : munaikundu02@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Purulia, Tusu,
Tusu Gaan,
Chaudal, Makar
Sankranti, Tusu
fair, Pitha-Puli,
Folk culture.

Abstract

The Tusu festival (also known as Tusu Parab or Makar Parab) is a harvest festival in rural Bengal. It is celebrated exclusively by unmarried women, young girls, and old alike in eastern India, which includes Purulia, Bankura, Midnapore and States of Bihar, Jharkhand and Odisha. This festival is celebrated during the winter season, typically in January, coinciding with the last day of the Poush month. It is a unifying form of common faith and belief of the agrarian society in joy of harvesting crops. The key features of the entire one month of celebrations are the Tusu songs which are the most popular traditional folk song, the food like sweets, Pitha-Puli and the famous Tusu fair. Tusu is considered as the goddess of crops. The Tusu song is sung throughout the month of Poush starting from Agrahayan Sankranti. It ends on Makar Sankranti, with the immersion of Tusu structures.

This paper, therefore, aims to explore the Rituals which perform during the Tusu Festival in Purulia as well as how it is observed in the present days. The main areas that have been highlighted in this paper are an overall idea about Tusu and how simple, hardworking rural people reflect their contemporary socio-economic, political and cultural image through Tusu songs.

Discussion

অবতরণিকা : জনজাতি ভিত্তিক সমাজজীবন, ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, আর্থ-সাংস্কৃতিক অবস্থা – সবমিলিয়ে পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতি শুধু বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়, বেশ সমৃদ্ধ। আবহমানকাল থেকে পুরুলিয়ার গ্রাম্য জীবনযাত্রা প্রণালী সহজ সরল সুন্দর সাবলীন কৃত্রিমতাশূণ্য কষ্টসহিষ্ণু। অভাব, অশিক্ষা দরিদ্রতা খরা ইত্যাদি নানা প্রতিকূলতাগুলি এখানকার মানুষদের নিজস্ব সংস্কৃতির লালন-পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। এখানকার সংস্কৃতির মর্মমূলে প্রোথিত আছে প্রকৃতিগত ধর্ম ভাবনা। অতি প্রাচীন কাল থেকে আজ পর্যন্ত সেই ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে। ‘পাইল-পরবের দেশ’ নামেও পরিচিত এই অহল্যাভূমি পুরুলিয়া। এখানকার মূলবাসীরা বংশ পরম্পরায় দিন, মাস, ঋতুভেদে, লৌকিক উৎসবের সূচনা করেন। এই উৎসবগুলির মূল উদ্দেশ্য হল একে অপরের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন। বারো মাসে তেরো পার্বণের জেলা হচ্ছে পুরুলিয়া। আর এই উৎসব পালনগান ছাড়া কোনদিনই সম্ভব নয়। গ্রাম্য মানুষজন তাদের স্বরচিত গান এবং নাচ সহযোগে যেকোনো

উৎসব অনুষ্ঠান আনন্দের সাথে পালন করে। বৈচিত্র্যময় উৎসব তাই গানের কথা এবং সুরও বৈচিত্র্যময়। বছরের এক এক সময় এক এক সুরের গান ভেসে বেড়ায় অহল্যাভূমির আকাশে বাতাসে।

বাস্তব অভিজ্ঞতা নির্ভর বর্তমান প্রবন্ধটির অন্যতম লক্ষ্য হল পুরুলিয়া জেলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম প্রধান উৎসব টুসু পরব সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা পাঠককুলের সম্মুখে তুলে ধরা এবং টুসু গানের মাধ্যমে কিভাবে গ্রাম্য সহজ, সরল খেটে খাওয়া মানুষ তাদের সমসাময়িক আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে তার গবেষণামূলক আলোচনা। পুরুলিয়ার জনজাতিদের এক লৌকিক উৎসব টুসু পরব বা মকর পরব। এই পরবের মূল আকর্ষণ হল টুসু গান। পৌষ মাসে পালিত হয় বলে একে পৌষালী উৎসবও বলা হয়। আজও পুরুলিয়া জেলার জনজাতি ভিত্তিক সমাজজীবনে দুর্গা পূজার চাইতেও যথেষ্ট আনন্দ সহকারে পালিত হয় মকর পরব বা টুসু পার্বণ। এ যেন সাবেক মানভূম তথা আজকের পুরুলিয়ার জাতীয় উৎসব।

নামকরণ সম্পর্কে মতান্তর : অঞ্চল ভেদে টুসুর নামকরণ নিয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে। ভাষাতত্ত্ববিদদের মতে টুসু শব্দটি অস্ট্রিক ভাষার অন্তর্গত। যার অর্থ ছোট পুতুল বা ছোট্ট মেয়ে।^১ অনেকের ধারণা তুষ তুষলির তুষ থেকে ‘টুসু’ শব্দটি এসেছে। তুষ-তুষলির সাথে টুসুর উচ্চারণগত মিল পরিলক্ষিত হয়। আবার অনেকের মতে টুসু একটি দেশীয় শব্দ। আবার কেউ কেউ মনে করেন, যে, ধানের তুষ থেকে টুসু শব্দটি এসেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার জনজাতিদের এক লৌকিক উৎসব টুসু। টুসু শস্য-এর দেবী। গ্রামীণ মানুষ নিজে কন্যার মত টুসুরানীর আরাধনা করে। এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। তাই পুরোহিত দ্বারা এর পূজা করা হয় না। বাড়ির মেয়েরা নিজেরাই গানের মাধ্যমে আরাধনা করে টুসুর। আবার কারো কারো মতে তস্য নক্ষত্র থেকে টুসু বা তুষ নামকরণ। কারো মতে টুসু হলেন পৌষলক্ষী, আবার কেউ বলেন আদিম শস্য উৎসবের দেবী, আবার কেউ বলেন - সার, মাটি দিয়ে ক্ষেত্র উর্বর করার প্রতীক হচ্ছেন টুসু। তবে এটা ঠিক যে, অগ্রহায়ণের শস্যভরা কৃষি পরিবারে টুসু নতুন সৃষ্টির মূর্ত প্রতীক, কুমারী মৃত্তিকা ফলবতী হবার মাস নামে পরিচিত। তাই কেউ কেউ টুসু পূজাকে লক্ষ্মীপূজা বলেও মনে করেন। স্থানভেদে টুসু কোথাও টুসুমনি, টুসুরানী, টুসুধনী বা টুসুমা বলে সম্বোধিত হয়।^২

টুসু পূজার আচার-আচরণ : দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বাংলার অধিকাংশ স্থানে পুরাতন প্রথা অনুযায়ী টুসু উৎসবে কোন মূর্তি পূজার প্রচলন নেই। তবে বর্তমানে দক্ষিণ পশ্চিম মানভূম, ধলভূম, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়ার কোন কোন অঞ্চলে টুসু মূর্তির প্রচলন চালু হয়েছে।^৩ পুরুলিয়াতে টুসু মূর্তির প্রচলন বিশেষ নেই। তবে বর্তমানে পুরুলিয়া জেলার অন্তর্গত বান্দোয়ান থানায় টুসু মূর্তি গড়ার প্রচলন দেখা যায়।^৪ অঘ্রাণ মাসের সংক্রান্তিতে সন্ধ্যাবেলা গ্রামের কুমারী মেয়েরা টুসু পাতে অর্থাৎ স্থাপন করে। তারপর টুসু মায়ের আরাধনা চলে অঘ্রাণ সংক্রান্তির দিন থেকে পৌষ সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত। টুসু গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে পূজিত হয় না, গ্রামে যেকোনো একজনের বাড়িতে সকলে মিলে টুসু স্থাপন করে। সেখানেই গ্রামের মেয়েরা দলবদ্ধভাবে মিলিত হয় এবং টুসু পূজা করে। একটি মাটির সরায় চালগুঁড়ি মাখিয়ে নেওয়া হয়। তারপর সেই সরার মধ্যে ধানের তুষ দেওয়া হয়। তুষের ওপর কাঁচফুল বসানো গোবরের ঢেলা, ধান, আতপ চাল, দুর্বা ঘাস, ইত্যাদি রাখা হয়। চালগুঁড়ি দিয়ে রাঙানো সরটিতে সিন্দুর এবং হলুদ রঙ দিয়ে তিলক কাটা হয়।^৫ অনেক সময় সরার পরিবর্তে নারকেলের অর্ধেক খোলা ব্যবহার করা হয়। খোলার উপরে ভালো করে গোবর মাটি দিয়ে একটু প্রলেপ দেওয়া হয়, তারপর সেই মাটির ওপর কাঁচফুল দিয়ে সাজানো হয়। নারকেলের খোলার ভেতর গোবরের ঢেলা, ধান, আতপ চাল, দুর্বা ঘাস রেখে সারটির উপরের অংশ ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুলুঙ্গিতে টুসুকে স্থাপন করা হয়। সরার চারপাশে গাঁদা ফুল বা বাসক ফুল দিয়ে ভালো করে সাজানো হয়। প্রতি সন্ধ্যায় গ্রামের কুমারী মেয়েরা একসাথে টুসুর চারপাশে বসে টুসু গান গাইতে থাকে। তবে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র কুমারী মেয়েরাই নয়, বিবাহিত মহিলারাও এই টুসু গানে সামিল হন। টুসু আরাধনার সঙ্গে ধর্মের কোন সরাসরি যোগ নেই কারণ টুসু দেবী নন - তিনি সীমান্ত বাংলার মানুষের আদরিনী কন্যা। টুসু মানবিক আবেদনে জারিত গৃহস্থ কন্যা। দুঃখ-বেদনা আত্মাদের আশ্রয়স্থল। তাই পূজো

করার জন্য পুরোহিত বা মন্ত্র কোনোটারই দরকার হয় না। মন্ত্রের পরিবর্তে গান গেয়ে এই টুসুর আরাধনা করা হয়। যেগুলিকে বলা হয় টুসু গান। গ্রামের মেয়েরা এই টুসু গানের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে তাদের জীবনের ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, ভালোবাসা সাংসারিক সুখ দুঃখ, আঞ্চলিক রীতিনীতি ইত্যাদি। চিড়া, গুড়, বাতাসা, মুড়ি ছোলা, মটর ভাজা, পিঠে, চিনি প্রভৃতি খুব সামান্য উপকরণ দিয়ে ভোগ নিবেদন করা হয়। এভাবেই অস্রাণ মাসের সংক্রান্তি থেকে পৌষ সংক্রান্তি পুরো একটি মাস ধরেই চলে টুসু পূজা।



Young girls worshipping Goddess Tusu, Image Source: sahapedia@Instagram

গ্রামীণ মেয়েদের দ্বারা টুসুর আরাধনা

সূত্র- www.slurp.com/article/makar-sankranti-2023-tusu-the-rustic-celebration-of-sacrifice-life-and-nature-1673436973636

টুসু গান : টুসু গান হল একপ্রকার লোকগীতি, যা মূলত টুসু উৎসবের সময় গাওয়া হয়। এই টুসু গানের মূল বিষয়বস্তু হলো প্রেম বিরহ দুঃখ আনন্দ এবং নারী জীবনের নানা দিক। কুমারী ও বিবাহিত নারীরা তাদের সুখ-দুঃখ ও সামাজিক অভিজ্ঞতা এবং কল্পনার প্রকাশ করে এ গানের মাধ্যমে। গ্রাম্য মেয়েদের দ্বারা তাত্ক্ষণিকভাবে রচিত হয় এই গান। যা তাদের আবেগ ও অভিজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ। টুসু গানের মাধ্যমে নারী জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন প্রেম, সম্পর্ক, সুখ-দুঃখ, দারিদ্র, কলহ, ঈর্ষা, সামাজিকতা এবং ঐতিহ্য প্রতিফলিত হয়। টুসু এক কথায় গার্হস্থ্য জীবনের গান। টুসু কখনো গৃহস্থের ছোট কন্যা রূপে, কখনো সখী পরিব্রতা কিশোরী রূপে বা কখনো বিবাহিত কন্যা রূপে গানের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। এইসব গান নারীর বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত। সুবিখ্যাত লোক সংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন যে – “এই উৎসব উপলক্ষে গীত গানগুলোতে দেবীর মাহাত্ম্য অপেক্ষা গার্হস্থ্য জীবনের বিভিন্ন দিক অধিক গুরুত্ব পায়।”

টুসু গানের মাধ্যমে সমসাময়িক সমাজচিত্র উপস্থাপনা : টুসু গানের মধ্য দিয়ে বাঙালি নারীর অবদমিত ইচ্ছাগুলিই যেন বাস্তব রূপ পায়, তাদের গানে, তাদের কথায়। এই সময় যে সব গান গাওয়া হয় তাতে শুধু শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার প্রার্থনায় বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি, নিজেদের জীবনের সুখ দুঃখ কামনা বাসনা দৈনন্দিন সমস্যা প্রভৃতির প্রকাশ ঘটে, তাই গানগুলি আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। কারণ গ্রামীণ এলাকাতে নারীদের বাক-স্বাধীনতা বা ক্ষমতায়ন তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায় না। কারণ গ্রামীণ সমাজ হচ্ছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। সমাজে একমাত্র পুরুষের আধিপত্য এবং মতামত প্রকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত। তাই অনেক সময় সেই গ্রামীণ মহিলারা তাদের দুঃখ কষ্ট ভাগ করে নেওয়ার মতো কোনো সুযোগ পের না। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে খুব বন্ধু ভাবাপন্ন তাও কিন্তু নয়। তাই তাদের মনের ইচ্ছে, অসন্তোষ, আক্ষেপ, দুঃখ-কষ্টগুলো তাদের স্বরচিত টুসু গানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় এবং লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের টুসু গানের মধ্যে বিষাদের সুর বেশি করে প্রতিফলিত হয়। আরেকটা কথা উল্লেখ করতেই হয়, যেহেতু নিম্নবর্ণীয় গ্রামীণ মানুষরা টুসুর আরাধনা করত তাই তাদের গানের মধ্যে কিন্তু উচ্চবর্ণীয় মানুষদের যেমন ব্রাহ্মণ্য জাতির প্রতি কোন বিদ্বেষ বা বিরূপ মনোভাব লক্ষ্য করা যায় না। টুসু গানের মাধ্যমে তারা কোন ব্যঙ্গাত্মক বা বিদ্রূপ মন্তব্য কিন্তু কোন উচ্চবর্ণীয় জাতির প্রতি

করে না। তাই তাদের গানে কোন বর্ণবিদ্বেষী মনোভাব লক্ষ্য করা যায় না। টুসু গান হল নিতান্তই আঞ্চলিক নিম্নবর্ণীয় মানুষের জীবনের গান। সেই রকমই কয়েকটি টুসু গান তুলে ধরার চেষ্টা করলাম এই প্রবন্ধে। এক বালিকা বধূ টুসু গানের সুরে জানিয়েছে তার বাবা মায়ের প্রতি তীব্র অভিমান ও অভিযোগ –

“ছোট ছিলম ভালো ছিলম।
ছিলম মায়ের দুলালী।।
ছোট বিহা দিলে মা কেনে।
আমি ঝাঁপ দিব দইরার মাঝে।।
ছোট বিহা দিলে মা কেনে।”^৬

আমাদের সমাজে এখনো পন দিয়ে কন্যাকে পাত্রস্থ করার রীতি প্রচলিত আছে। অনেক সময় দরিদ্র পিতার পক্ষে কন্যার বিবাহের জন্য পণের টাকা যোগাড় করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। টুসু গানের মাধ্যমে কন্যা কে বিবাহ দেওয়ার জন্য টাকা জোগাড়ের দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে –

“বিটির বিহা দিব কেমনে।
আমার ঘুম ধরে না নয়নে।।
এমনই যুগের রীতিনীতি।
পনছাড়া বিকায় না।।
বিটির বিহা দিব কেমনে।”^৭

প্রত্যেক পিতা-মাতার কাছে তার নিজ সন্তান অন্যের সন্তানের থেকে সুন্দর। সন্তানের রূপ ও গুণের প্রশংসা করা প্রত্যেক পিতা-মাতার স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তাদের সন্তানের প্রতি অহংকার টুসু গানের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে –

“আমাদের টুসু মুড়ি ভাজে।
সাত কপাটের ভিতরি।।
তোদের টুসু জংলি মাগী।
আঁচল পেতে লয় মুড়ি।”^৮

ক্রমবর্ধমান দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধিতে দরিদ্র মানুষদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায় টুসু গানে –

“আমার বইল না বাজার যাইতে।
বৌদি ওগো শুন কান পাইতে।।
আটা ময়দা খাবে যদি লাইন দিবে কন্টোলে।
বৌদি ওগো শুন কান পাইতে।।
বলি পান্ত ভাতে দাও বেগুন পড়া।
বাজারে সব জিনিসে দাম চড়া গো দাম চড়া।।
পান্ত ভাতে দাও বেগুন পড়া।”^৯

তৎকালীন লোকসভার সদস্য ভজহরি মাহাতো যে কয়েকটি রাজনৈতিক ভাবনা পুষ্ট টুসু গান বাঁধেন তার মধ্যে বিখ্যাত ঐতিহাসিক টুসু গানটি হল –

“শুনো বিহারী ভাই,
তোরা রাখতে লারবি ডাঙ্গ দেখাই।।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি।
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।।
ভাইকে ভুলে করলি বড়।
বাংলা-বিহার বুদ্ধিটাই।।
বাঙালি বিহারী সবাই।
এক ভারতের আপন ভাই।।
বাঙালিকে মারলি তবু।
বিষ ছড়ালি হিন্দি চাই।।
বাংলা ভাষার দাবিতে ভাই।
কোন ভেদের কথা নাই।।
এক ভারতে ভাইয়ে ভাইয়ে।
মাতৃভাষায় রাজ্য চাই।।”^{১০}

টুসু গানগুলির মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়েছে প্রেম, ভালোবাসা, বন্যা, খরা দৈনন্দিন দিনযাপনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা সবকিছুই। এই গানের মধ্যে রয়েছে, নারী চেতনার সুপ্তবীজ, তাদের অব্যক্ত ব্যথা বেদনার নীরব ভাষা। মেয়েরাই এই টুসু গানের রচয়িতা ও প্রচারক।

টুসু জাগরণ ও বিসর্জন : পৌষ সংক্রান্তির তিন দিন আগে থেকে শুরু হয় মকর উৎসব। প্রথম দিন ‘আঁউড়ি’। এই দিন গ্রামের মেয়ে বউরা তাদের বাড়িঘর পোষাক-পরিচ্ছদ সমস্ত কিছু ভালো করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে শুদ্ধিকরণ করে। দ্বিতীয় দিনকে বলে ‘চাঁউড়ি’। চাঁউড়ির দিন গ্রামের মেয়ে বৌ মিলে টেকির সাহায্যে চাল গুঁড়ো করে গুঁড়ি তৈরি করে। পরের দিন অর্থাৎ তৃতীয় দিন ‘বাঁউড়ি’।^{১১} এই দিন সকাল বেলা থেকে গ্রামের প্রতিটি ঘরে পিঠে বানানো শুরু হয়ে যায়। চাঁচি, তিল, নারকেল প্রভৃতির পুর দিয়ে পিঠে বানানো হয়। বাঁউড়ির রাতে শুরু হয় টুসুর জাগরণ অনুষ্ঠান। সারারাত ধরে চলে গানের আসর। যে কক্ষের মধ্যে জাগরণ অনুষ্ঠান চলে সেই কক্ষটি সুন্দর করে ফুল আলো দিয়ে সাজানো হয়। জাগরণের রাতে নানা রকম মিষ্টি, মিঠাই, জিলিপি, হলুদমুড়ি, ছোলা ভাজা, মটর ভাজা, নারকেল নাড়ু, তিল নাড়ু, মুড়ির নাড়ু, চিড়ার নাড়ু নানা রকমের পিঠে টুসুর ভোগ হিসেবে নিবেদন করা হয়। জাগরণের রাতে টুসু গানে মুখর হয়ে ওঠে গ্রাম বাংলার আকাশ বাতাস।

টুসু জাগরণের রাত পোহালেই ফুল-মালা, রঙিন কাগজ সহযোগে সাজানো হয় টুসুর চৌডল। এই চৌডলটি তৈরি হয় বাঁশের বাতা বা সরু কাঠ দিয়ে। চতুষ্কোণ কাঠামো বিশিষ্ট এই চৌডলের উপরের অংশটি মন্দিরের চূড়ার মত আকৃতির হয়।^{১২} রং-বেরঙের কাগজ দিয়ে এটিকে সাজানো হয়। উল্লেখ্য, একটি দলের একটি চৌডল থাকে। অনেক জায়গায় চৌডলের ভেতরে টুসুর সরাটি রাখা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরাটি চৌডলের বাইরে রাখা হয়। কুমারী মেয়েরা টুসু গান গাইতে গাইতে টুসুকে চৌডলে বসিয়ে হাজির হয় পুকুর পাড় কিংবা নিকটবর্তী নদীতীরে। বেদনার্ত মন নিয়ে তারা গান করে -

“জলে হেল জলে খেল।
জলে তুমার কে আছে।।
মনে করে দেখ টুসু।
জলে শ্বশুর ঘর আছে।।”^{১৩}

কাঁসাই, শিলাই, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীর বহুঘাটে টুসু বিসর্জনকে কেন্দ্র করে টুসু মেলা বসে। সাধারণ মানুষের ঢল নামে এই টুসু মেলাকে কেন্দ্র করে। কনকনে শীতকে উপেক্ষা করে পুণ্যমকর স্নানের উদ্দেশ্যে নদীর ঘাটগুলিতে মানুষের ভিড় জমে ওঠে। গ্রামের মেয়েরা তাদের রঙিন চৌডল নিয়ে টুসুগান গাইতে গাইতে নদীর জলে বিসর্জন দেয় তাদের আদরিনী টুসুরানীকে। বিষাদের ছাপ ফুটে ওঠে এক মাস ধরে আরাধনা করে আসা গ্রামের কুমারী মেয়েদের মুখে। টুসু বিসর্জনের পর মেয়েরা নদীতে অবগাহন স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করে। নদীর ঘাটে বসেই তারা মুড়ি, নাড়ু, পিঠে ইত্যাদি খায়। পুরুলিয়ার বিভিন্ন স্থানে টুসু মেলা আয়োজিত হলেও স্থান-কাল-পাত্র ভেদে তার মূল সুর একটাই টুসুর চৌডল বিসর্জনের মধ্য দিয়ে টুসু মেলায় মেতে ওঠা।



1. টুসুর চৌডল



2. টুসু বিসর্জন

সূত্র - 1. www.hellotravel.comeventstusu-parab-or-makar 2. <https://thespace.inkphoto-storyphoto-story-on-tusu-festival-in-bengal>

পুরুলিয়ার টুসু মেলা : পৌষ সংক্রান্তির ভোরবেলা নদী বা বড় পুকুরের জলে টুসুর ভাসান হয়। টুসু গান, কাঠিনাচ এবং মকর মেলায় এখানকার সমস্ত বর্ণের মানুষ যেমন একাত্ম হয়ে উৎসব মুখর হয়ে ওঠে, আনন্দের শ্রোতে ভাসে, তেমন বছরের আর অন্য কোন সময় তা তেমন ভাবে চোখে পড়ে না। তাই প্রকৃত অর্থে বলা চলে, টুসু মেলা হল মিলন মেলা। আজকের পুরুলিয়ার জাতীয় উৎসব। পুরুলিয়ার টুসু মেলা প্রসঙ্গে আড়ম্বর ও জনপ্রিয়তার নিরিখে ঝালদা থানার অন্তর্গত তুলিনের টুসু মেলা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরুলিয়া ছাড়াও ভিন রাজ্যের মানুষজনও সুবর্ণরেখা নদীর তীরে মিলিত হয় এই টুসু মেলা কে কেন্দ্র করে। এছাড়া জয়পুর ও আড়সা সীমানায় কাঁসাইকুলে, দেউলঘাটা মন্দির প্রাঙ্গণে টুসু মেলাকে কেন্দ্র করে মানুষের ভিড় উপচে পড়ে। বান্দোয়ানের যমুনা বাঁধ, পুঞ্চ থানার শিলাই, টুসু মেলায় আদিবাসীদের উপস্থিতি থাকে চোখে পড়ার মতো। জেলা শহর পুরুলিয়া ও আশেপাশের লোকজন ভিড় জমান শহরের উপকণ্ঠে কংসাবতীর তেলেডি ঘাটে অথবা পুরুলিয়া ব্লক 2 এর অন্তর্গত মহাদেব বেড়া গ্রামে কংসাবতীর তীরে। জনজোয়ারে মুখর হয়ে ওঠে কাঁসাই-কংসাবতী- শিলাই-কুমারী-সুবর্ণরেখা নদী। বেলা বাড়ার সাথে সাথে মানুষের ভিড় বাড়তে থাকে। টুসু মেলার অন্যতম আকর্ষণ মোরগ লড়াই। বিভিন্ন জায়গায় টুসু ভাসানের স্থানে মোরগ লড়াইয়ের আখড়া বসে। টুসু চৌডলের প্রতিযোগিতা হয়। সব মিলিয়ে পুরুলিয়ার টুসু মেলা যথার্থই মনমুগ্ধকর এক মিলন মেলা।^{১৪}



টুসু মেলা

সূত্র- www.hellotravel.comeventstusu-parab-or-makar

বর্তমানে টুসু পূজা বা টুসু গানের প্রতি অনীহা : তবে বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাই আজকের প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের লোকসংস্কৃতি পালন করার প্রতি এক অনীহা। তাই কুড়ি-পঁচিশ বছর আগেও সারা পৌষ মাস জুড়ে প্রতিদিন সন্ধ্যায় টুসু গানের যে চর্চা মহিলারা করতো, আজকের দিনে তার গুরুত্ব অনেকখানি হ্রাস পেয়েছে। সারাদিনের ব্যস্তময় জীবনযাত্রায় মানুষ এখন এতটাই ক্লান্ত যে, নিজেদের মানসিক শান্তি বা ক্লান্তি দূর করার জন্য তারা কৃত্রিম বিনোদনের পথ বেছে নিচ্ছে। সন্ধ্যা বেলা এখন প্রত্যেকের বাড়িতে টিভি, রেডিও, মোবাইল ফোন মানুষের সৃজনশীল ভাবনাকে বহুলাংশে গ্রাস করে ফেলেছে। তাদের সৃষ্টিশীল মনোভাব এখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দাপটে প্রায় অবলুপ্তির পথে। কবিতা, গান, লোকগীতি রচনা করার সময় বা ইচ্ছে আর মানুষের নেই। মোবাইলের এক সুইচ টিপেই যখন সমস্ত কিছু তার হাতের নাগালে চলে আসে তখন আর কষ্ট করে মাথা খাটিয়ে কিছু রচনা করার ইচ্ছা হয়তো আর এই প্রজন্মের ছেলে মেয়েদের মধ্যে দেখা যাবে না। ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে আমাদের লোকসংস্কৃতি। এগুলি ছাড়াও আরো কয়েকটি কারণ এর জন্য দায়ী বলে মনে করি যেমন -

প্রথমত, বিশ্বায়নের করাল গ্রাস লোকসংস্কৃতিকে সার্বিকভাবে বিপন্ন করে তুলেছে। বিশ্বায়নের ফলে এক দেশের সাথে আরেক দেশের সংস্কৃতিগত বিভেদ বৈষম্য প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে গরীব আরও গরীব হচ্ছে, বড়লোক আরো বড়লোক হচ্ছে।^{১৫} গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র ও রিক্ত জনজাতি গোষ্ঠীগুলিই বৃকে আঁকড়ে রেখেছে লোকসংস্কৃতির ধারাকে। কৃষি নির্ভর অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে বেঁচে থাকা এই গ্রাম্য মানুষগুলি জীবিকার অনিশ্চয়তা জনিত হতাশার জন্য, পূর্বের মতো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মনসংযোগ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। কৃষি নির্ভর অর্থনীতির উপর ভিত্তি করে বেঁচে থাকা এই গ্রাম্য মানুষগুলি জীবিকার অনিশ্চয়তা জনিত হতাশার জন্য, পূর্বের মতো সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে মনসংযোগ করা তাদের পক্ষে আর সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। বছরের যে কোন সময় টুসুর আরাধনা করা হয় না। বিশেষত অম্বাণ মাসে যখন বাড়িতে নতুন ধান আনে গ্রাম্য মানুষজন তখন শস্য দেবী হিসেবে টুসুর পূজো করে। বর্তমানে পুরুলিয়া পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেছে। নানা জায়গার মানুষ পুরুলিয়া বেড়াতে আসে। ফলে এখানে বিভিন্ন শিল্প যেমন হোটেল, রিসোর্ট, পুরুলিয়ার বিখ্যাত মুখোশ শিল্প, লাক্ষা শিল্প, ছোঁনাচ ইত্যাদি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এখানকার মানুষের জীবনযাত্রা এখন অনেকটা আঞ্চলিক শিল্পনির্ভর হয়ে উঠেছে। যেমন পর্যটকদের পছন্দ অনুযায়ী যেকোনো সময় ছৌ নাচ প্রদর্শন করা যায়। এতে ছৌ শিল্পীদের আয়ের পথ সুগম হয়। এখানকার বিভিন্ন হোটেল ও রিসোর্টের সাথে ছৌ শিল্পীদের যোগাযোগ থাকে, তারাই পর্যটকদের জন্য ছোঁনাচের ব্যবস্থা করে দেয়। তাই বর্তমানে ছৌ নাচ শেখার ক্ষেত্রে পুরুলিয়া ছেলেমেয়েদের মধ্যে আগ্রহ দেখা যায়। কারণ জীবিকা নির্বাহের বিকল্প পথ হিসেবে তারা ছৌ নাচকে বেছে নেয়। কিন্তু টুসুর ক্ষেত্রে এই সম্ভাবনা খুবই কম। মকর সংক্রান্তির সময় কেবলমাত্র টুসু মেলা বসে, সেই সময় কিছু দোকানপাট গ্রামের মানুষ দেয় এবং খুব সামান্যই বিক্রি বাটা হয় তাদের। কিছু পর্যটক হয়তো সে সময় টুসু মেলা দেখতে পুরুলিয়া আসে, মানুষজন সেই মেলাতে তাদের কাছে জিনিসপত্র বিক্রি করে যে আয় করে তা দিয়ে সারা বছর জীবিকা নির্বাহ করা সম্ভব নয়। ফলে টুসু মেলা বা টুসু গান, বা টুসু স্থাপন করার ক্ষেত্রে গ্রাম্য মানুষদের বর্তমানে অনীহা দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, ক্রমবর্ধমান দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধিতে দরিদ্র মানুষের অবস্থা এখন শোচনীয়। কোন উৎসব অনুষ্ঠান পালনের জন্য দরকার টাকা-পয়সার। এই গ্রামীণ মানুষগুলোর জীবিকা নির্বাহ করায় যেখানে কঠিন ব্যাপার সেখানে উৎসব আনন্দ করা বিলাসিতায় পরিণত হয়েছে। দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতেই এদের দিনরাত প্রাণপাত করতে হয়।

তৃতীয়ত, নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাব। বর্তমানে এই মাতৃভাষা, লোকাচার, লোককথা, লোকসংগীত - এগুলো বর্তমান প্রজন্মের কাছে হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। গ্রামাঞ্চলের ছেলে মেয়েরাও এখন শহরে পড়াশোনা করার জন্য আসে। তারা শহরের সংস্কৃতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য ভুলে যায় তাদের পূর্বপুরুষ লালিত লোকসংস্কৃতিকে। নিজ মাতৃভাষায় কথা বলতেও এখন তারা দ্বিধাবোধ করে। তারা আয়ত্ত করে নাগরিক ভাষা। তাই সে সংস্কৃতিকে ধারাবাহিক

ভাবে বহন যাওয়ার দায়িত্ব তারা পালন করতে চাই না। বর্তমান প্রজন্ম এখন AI Technology-র যুগে বাস করছে। সারাদিন মোবাইল ফোনে ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ, রিলস বানাতেই তারা ব্যস্ত। তাই আজকের দিনে পুরুলিয়ার টুসু মেলাগুলিতে টুসু গান তেমনভাবে শুনতে পাওয়া যায় না। বর্তমান যুগে লোকসংস্কৃতি যে সার্বিকভাবে বিপন্ন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে আমাদের লোকসংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।

টুসু গানের তাৎপর্য : টুসু পূজা ব টুসু গানের বিশেষ তাৎপর্য লক্ষ্য করা যায়। গ্রামীণ এলাকায় টুসু কন্যা স্বরূপা হিসেবে পূজিত হয়। গ্রামীণ এলাকায় যেখানে মেয়েদের বাক স্বাধীনতা বা মতামত প্রকাশের অধিকার তেমনভাবে স্বীকৃত নয়, সেখানে টুসু গানের মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলারা নারী জীবনের বিভিন্ন দিক যেমন প্রেম, সম্পর্ক, সুখ-দুঃখ, দারিদ্র, কলহ, ঈর্ষা, সামাজিকতা এবং ঐতিহ্য তুলে ধরে। সুতরাং আমরা বলতেই পারি টুসু গান হলো নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। ক্ষমতায়ন বলতে আমরা বুঝি সচেতনতা জাগরণ। আমাদের জন্য কোনটা ঠিক, কোনটা ঠিক নয়, কোনটা আমাদের অধিকার, কোনটা আমাদের অধিকার নয়, এই বোধ যখন আমাদের মধ্যে জাগরিত হয় তখনই কিন্তু আমাদের মধ্যে ক্ষমতায়নের ধারণা তৈরি হয়। এই টুসু গানের মধ্যে গ্রামীণ মহিলারা কিন্তু তাদের অধিকারবোধ জনসমক্ষে তুলে ধরে তাদের নিজ মাতৃভাষার সাহায্যে। সমাজে তাদের অবস্থান, অধিকার, অসম্মান সমস্তটাই কিন্তু ফুটে ওঠে সুন্দর গানের মাধ্যমে। তাই আমরা বলতেই পারি ক্ষমতায়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে টুসু গানকে তারা বেছে নিয়েছে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। নারীর সচেতনতা এবং নারীর ক্ষমতায়নের অন্যতম পথ হিসেবে টুসু গান বর্তমান সময়ে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক এবং গুরুত্বপূর্ণ।

পরিশেষে মানভূমের প্রখ্যাত গবেষক দিলীপ কুমার গোস্বামী মহাশয়ের কথায় সহমত হয়ে বলতে চাই মানভূম হল গানভূম, নাচভূম, প্রবাদভূম। এই গানগুলিকে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। এখানের মানুষের চলতে গেলেই নাচ, কথা বললেই গান - এই স্বতঃস্ফূর্ততা বাঁচিয়ে রাখতেই হবে। লোকগান, লোকনৃত্য, লোকিক উৎসব, লোকশিল্প আমাদের প্রাণ। হাজার যন্ত্রণা সহ্য করেও আমাদের পূর্বপুরুষরা কঠোর গান ছাড়েননি, লোকনৃত্যকে নিয়ে গেছেন বিশ্বের দরবারে। আর সেই ঐতিহ্যকে ধারণ ও বহন করার গুরু দায়িত্ব আমাদের ওপরই বর্তায়।

Reference:

১. মহাপাত্র, সিংহ, রামামৃত, 'পৌষের পরম টুসু-তুষ-তুষ-তুষলীর', লোকসংস্কৃতির দর্পণে পুরুলিয়া, কার্তিক কুমার মন্ডল, সংবেদন, ২০১৮, পৃষ্ঠা - ৮৭
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, দিব্যেন্দু, 'মানভূমের টুসু', পুরুলিয়ার লোককথা, ডঃ দয়াময় রায়, নরেন সেনগুপ্ত এবং দেবলীনা অধিকারী, রংমিলাস্তি প্রকাশনী, ২০১৮, পৃষ্ঠা - ১৯
৩. গরাই, শিবপ্রসাদ, 'টুসু পরব', লোকসংস্কৃতির দর্পণে পুরুলিয়া, কার্তিক কুমার মন্ডল, সংবেদন, ২০১৮, পৃষ্ঠা - ৮৩
৪. গোস্বামী, কুমার, দিলীপ, *সীমান্ত রাঢ়-এর লোকসংস্কৃতি*, পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৩৯
৫. গোস্বামী, কুমার, দিলীপ, *সীমান্ত রাঢ়-এর লোকসংস্কৃতি*, পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৩৭
৬. দে, মৃত্যুঞ্জয়, 'টুসু গান : সমসাময়িক আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি', জঙ্গলমহল সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড), ইয়াসিন খান, ২০১৯, পৃষ্ঠা - ১২৩
৭. দে, মৃত্যুঞ্জয়, 'টুসু গান : সমসাময়িক আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি', জঙ্গলমহল সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড), ইয়াসিন খান, ২০১৯, পৃষ্ঠা - ১২৪
৮. দে, মৃত্যুঞ্জয়, 'টুসু গান : সমসাময়িক আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি', জঙ্গলমহল সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড), ইয়াসিন খান, ২০১৯, পৃষ্ঠা - ১২৬

-
৯. দে, মৃত্যুঞ্জয়, 'টুসু গান : সমসাময়িক আর্থসামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি', জঙ্গলমহল সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড), ইয়াসিন খান, ২০১৯, পৃষ্ঠা - ১২৭
 ১০. গোস্বামী, কুমার, দিলীপ, *সীমান্ত রাঢ়-এর লোকসংস্কৃতি*, পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৪৯, ৫০
 ১১. মহাপাত্র, সিংহ, রামামৃত, 'পৌষের পরম টুসু-তুষু-তুষ-তুষলীর', লোকসংস্কৃতির দর্পণে পুরুলিয়া, কার্তিক কুমার মন্ডল, সংবেদন, ২০১৮, পৃষ্ঠা - ৮৯
 ১২. গোস্বামী, কুমার, দিলীপ, *সীমান্ত রাঢ়-এর লোকসংস্কৃতি*, পারিজাত প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ২০১৬, পৃষ্ঠা - ৬১, ৬২
 ১৩. মহাপাত্র, সিংহ, রামামৃত, 'পৌষের পরম টুসু-তুষু-তুষ-তুষলীর', লোকসংস্কৃতির দর্পণে পুরুলিয়া, কার্তিক কুমার মন্ডল, সংবেদন, ২০১৮, পৃষ্ঠা - ৯১
 ১৪. সিং, শিবশংকর, *পুরুলিয়ার লোকমেলা*, নলেজ ব্যাংক পাবলিশার্স অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটর্স, কলকাতা, ২০২১, পৃষ্ঠা - ৯৪
 ১৫. দাশ, চন্দ্র, নারায়ণ, 'জঙ্গলমহল সংস্কৃতি ও বিশ্বায়ন', জঙ্গলমহল সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্য (দ্বিতীয় খন্ড), ইয়াসিন খান, ২০১৯, পৃষ্ঠা - ৩৯